Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাখিনা আখতার

রোলঃ 228021942

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাখিনা আখতার

রোলঃ 228021942

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাখিনা আখতার, আইডিঃ 228021942 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলামের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাখিনা আখতার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাখিনা আখতার

আইডিঃ 228021942

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
বর্তমান অর্থনীতি ব্যবস্থা 6
ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা 10
আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা 15
আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার মারাত্মক দোষ 17
ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা 19
ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম 24
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য 26
হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথেই ব্যয় 27
ধন–সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন 29
যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন 30
বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা 31
ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন 32
করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন 33
ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ 34
ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন 35
উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন 37
ব্যবসায়িক অসাধুতা ও সব ধরনের জুয়া উচ্ছেদ 38
ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ 40
সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা 41
পরিশেষ 42
তথ্যসূত্র 43

ভূমিকা

যে কয়টি প্রধান প্রধান উপাদান আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার অন্যতম হলো অর্থ। কারো কারো মতে অর্থই নিয়ন্ত্রক শক্তি। তাই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে চিন্তাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং করছেন। গড়ে তুলেছেন বহু অর্থনৈতিক মতবাদ। একটার পর একটা মতবাদ চালু করা হচ্ছে মানব সমাজে।পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে কার্যকর করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এখন চলছে পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির ছড়াছড়ি।আমাদের চোখের সামনে আছে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক মতবাদ। এভাবে একটার পর একটা মতবাদ আসছে আর পরীক্ষা চলছে। কোনটিই

মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পারেনি, দিতে পারেনি মুক্তি।

আসলে মানব মস্তিষ্ক প্রসূত কোন মতবাদই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনা। মানুষের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র খোদায়ী বিধান, তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আর এ জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ মানব জীবনের সকল বিভাগকে পূর্ণাঙ্গভাবে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামী অর্থনীতিই অর্থনৈতিক মুক্তিও উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।

বর্তমান অর্থনীতি ব্যবস্থা

বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক -এই দুই প্রকারের অর্থব্যবস্থাই বাস্তবে প্রচলিত রয়েছে। প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে এই দুটিই গ্রাস করে আছে। অথচ মানবতা এই উভয় ব্যবস্থার মধ্য বঞ্চিত ও নিপীড়িত। বস্তুত এইসব ব্যবস্থায় মানুষ কোনক্রমেই সুখী হতে পারেনা, তা উভয় ব্যবস্থার আদর্শিক বিশ্লেষণ হতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হবে।

★পুঁজিবাদ:

পুঁজিবাদ অর্থ ব্যবস্থার ছয়টি মূলনীতি এখানে উল্লেখ করা হলো। পুঁজিবাদ অর্থীতির প্রথম মূলনীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার। এতে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখার সুযোগই নয়, তাতে সকল প্রকার উৎপাদন -উপায় এবং যন্ত্রপাতি ইচ্ছামত ব্যবহার ও প্রয়োগের সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতো অবলম্বিত যেকোনো পন্থা ও উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং যে কোন পথে তা ব্যয় এবং ব্যবহারও করতে পারে ;যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদূর ইচ্ছা মুনাফাও লুটতে পারে।শ্রমিক নিয়োগের যেমন সুযোগ রয়েছে, তাদেরকে শোষণ করে এক একচ্ছত্রভাবে মুনাফা লুণ্ঠনের পথেও সেখানে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নেই।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের জন্মগত ইচ্ছা রয়েছে। এর দাবী সম্পন্ন এবং বাস্তব রুপায়নের জন্য ব্যক্তিকে উপার্জন করার এবং এর ফল এক হাতে সঞ্চিত করে রাখার সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয় মূলনীতি অনুযায়ী এই সুযোগ না দিলে মানুষ কিছুতেই অর্থ উৎপাদনের জন্য উৎসাহী ও অগ্রণী হবেনা।

পুঁজি বাদে তৃতীয় মূলনীতি হল অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মূলত ইহা “ বাঁচার লড়াই “ নামক দার্শনিক স্লোগান হতে উদ্ভূত।

প্রথম শ্রেণীর লোক নিজেদের একক দায়িত্বে পণ্য উৎপাদন করে ;তাতে মুনাফা হলে তা দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সিন্ধুক ভর্তি করে, লোকসান হলে একাই নিরবে হজম করি।শ্রমিকের উপর উহার বিশেষ কিছু প্রভাব প্রবর্তিত হয় না। ইহার ভিত্তিতে পুঁজিদারগন নিজেদের অমানুষিক ও কঠোরতম কার্যকলাপ কেও ন্যায় সঙ্গত প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। পুঁজিদারদের যুক্তি এইযে, মূলধন বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন ইত্যাদিতে সকল প্রকার ঝুঁকি ও দায়িত্ব যখন তারাই গ্রহণ করে, তখন মুনাফা হইলেও তা একক ভাবে তাদেরই প্রাপ্য এবং শ্রমিকদিগকে

শোষণ করারও তাদের অবাধ সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত শ্রমিক শোষণই পুঁজিবাদ অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার।

পঞ্চম মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন ও আয় উৎপাদনের উপর কোনরুপ হস্তক্ষে করতে পারবেনা এবং ব্যক্তিগণের কাজের অবাধ সুযোগ করে দেওয়াই রাষ্ট্র সরকারের দায়িত্ব।

ষষ্ঠ মূলনীতি :সুদ,জুয়া প্রতারণামূলক কাজ -কারবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিনা সুদে কাউকে কিছুদিনের জন্য "এক পয়স"দেওয়া পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা।বরং 'বিনিময়' অবশ্যই আদায় করিতে হয় এবং উহার হার পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক, অভাব অনটন দূর করার জন্য সাময়িক ঋণ হোক কিংবা অর্থ উপার্জনের উপায় -স্বরূপ মূলধন ব্যবহারের জন্যও হোক, কোন প্রকার লেনদেন বিনা সুদে সম্পূর্ণ করা পুঁজিবাদী সমাজ অসম্ভব।
পুঁজিবাদী অর্থনীতির উল্লেখিত মূলনীতি সমূহ একটু সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে দেখলে বুঝতে পারা যায় য, ইহা কখনোই সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারেনা। শুরুতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে ইহা মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু উহার প্রথম অধ্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর অন্তরীন ত্রুটি ও ধ্বংসকারিতা লোকদের সম্মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারা দেখতে পায় যে সমাজের ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্য, কিন্তু তা মুষ্টিমেও পুঁজিপতির সর্বগ্রাশি হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে আর কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব ও বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। ইহা ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে একেবারে পথের ভিখারি করে দিচ্ছে। একদিকে অসংখ্য পুঁজিদার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।অপরদিকে দরিদ্র দুঃখী সর্বহারা মানুষের কাফেলা হামাগুড়ি দিয়ে চলে সীমাহীন -সংখ্যাহীন। পুঁজিবাদের সমাজের এই আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও আজ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক বলেছেন, "বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম এবং সর্বাপেক্ষা বেশি আয়ের মধ্যে শতকরা বিশ লক্ষ্য গুড পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য এক একটি সমাজে যে কত বড় ভাঙ্গন ও বিপর্যয় টানিয়া নিতে পারে, তাহা দুনিয়ার বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।"

পুঁজিবাদী সমাজের আরও একটি মৌলিক ত্রুটি হল বাস্তব ক্ষেত্রে ধনী শ্রেণী হয় উহার শাসক ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।তারা মিলিতভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতার সাথে গরিব,দুঃখী কৃষক ও শ্রমিককে শোষণ করে,তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও রক্ত পানি করে উপার্জিত

ধন সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করে বিলাসিতার চরম পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করে। মানুষের বুকের রক্ত নিয়ে উৎসবের হোলি খেলায় মেতে উঠে। সত্যি নেশায় মত্ত হয়ে নিরীহ জনতার উপর অমানসিক নির্যাতন চালায়।গোটা দেশের বিপুল অর্থ সম্পদ বিন্দু বিন্দু করে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে সঞ্চিত হয়ে পড়ে। তখন সমাজের কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র ও অভাব অনটনের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট হতে জানা যায়, দুনিয়ার সর্বাধিক বৈষয়িক ও বাস্তব উৎকর্ষ লাভ হওয়া সত্বেও উহার শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক অধিবাসী প্রয়োজনানুরুপ খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা হতে বঞ্চিত রয়েছে। এ তিক্ত সত্য হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুখী ও সুসমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে, সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অধিকার আদায় করতে এবং মানব সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি স্থাপন করতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

★সমাজতন্ত্র :

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদি সমাজের মজলুম সুজিত মানুষকে বুঝ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। ইহার উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। এজন্য সমাজতন্ত্র অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায় -উপাদান ও যন্ত্রপাতি means and instruments of production জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ অর্থব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ইহা এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে তিক্ত ফল দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করেছে তা সকল দিক দিয়েই ভয়াবহ।

এক দিকে তা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অধিকার হরন করেছে অপরদিকে সাধারণ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও সুবিধার গালভরা দাবি পুঁজিবাদী দেশের মতোই অপূর্ণ অবাস্তব হয়ে রয়েছে। স্বয়ং রাশিয়ার সরকারি সূত্র হইতে জানা যায়, সে দেশের জনগণের আয়ের হারে পাঁচশত ও তিন লক্ষের পার্থক্য বিদ্যামান। অনুরূপভাবে এ কথাও আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানেও অসংখ্য অন্য বস্ত্রহীন মানুষ বাস করে। রাশিয়ার ভিক্ষুকদের বিপুলতা দেখে তথাকার এক যুব প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তীব্র প্রতিবাদের আওয়াজ তোলে এবং অবিলম্বে উহার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় দাবি করে। এ দেশের যে সকল প্রতিনিধি রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন, তাদের বিবৃতি ও রচনাবলী হতে প্রমাণিত হয় যে, সমাজতন্ত্রের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং যে অলৌকিক ভূস্বর্গ রচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যে রঙীন ও চিত্তাকর্ষক চিত্র-দ্বারা জন-মানুষদের লোভাতুর করে এক রক্তক্ষয়ী

সংগ্রামী উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, মূলত তা সবই আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে। বাস্তব দুনিয়ায় উহার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ— উভয়ই খোদাহীনতা ও ধর্মহীনতার গর্ভ হতে উদ্ভূত বলে উভয় সমাজের মানুষই মনুষ্যত্বের মহান গুণ-গরিমা হতে বঞ্চিত হয়েছে,মানুষকে নিতান্ত পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। মানুষ আকৃতি বিশিষ্ট এই "পশু"গণ তাই আজ পরস্পরের সহিত শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান সময়ের দুটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ঝগড়া বিবাদ, সীমান্ত সংঘর্ষ ওর যুদ্ধবিগ্রহ সমাজতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক দেশ মানুষের বাসোপযোগী নয়। সমাজতান্ত্রিকতার নামে সেখানে মানুষের জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ, স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতা চিরতরে হরণ করে নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির কোনই মূল্য সেখানে স্বীকৃত নয়।সমাজস্বার্থকে সেখানে সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক রূপে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি কে সমাজ ও সমষ্টিস্বার্থের বেদীমূলে বলিদান করা হয়েছে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সামষ্টিক যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তার নিজের প্রকৃতি বা প্রয়োজন অনুসারে কোন কাজ করার বিন্দুনমাত্র অধিকার তার নেই।লেনিন "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছেন, "পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিকদের ক্ষমতা দখল করার এক কঠিন ও ধনসাত্মক বিপ্লব ব্যতীত মাত্রই সম্ভব নয় "।সমাজতন্ত্রের তৃতীয় পিতা' স্ট্যালিন-ও ইহার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,

"এক কঠিন ও কঠোর সর্বাত্মক বিপ্লব ব্যতীত বুর্জোয়া সমাজে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করা কি সম্ভব?........ প্রোলেটারিয়ানদের ডিক্টেটরী শাসন-কর্তৃত্ব ব্যতীত?......নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমার মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে এই রূপ কোন বিপ্লব সৃষ্টির সম্ভব বলে যদি কেউ মনে করে, তবে হয় তার মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছে, অন্যথায় মানুষের সাধারণ বুদ্ধি হতেও সে বঞ্চিত। "

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে,পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র কোনটিই মানুষকে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণ, উন্নত, মানুষত্বের মর্যাদা স্থাপনকারী এবং সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা দান করতে মাত্রই সমর্থ হয় না। এই উভয় অর্থব্যবস্থায় কোনোটিই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বরং ব্যাপারটিকে এরা আরো অধিকতর জটিল করে তুলছে। অসংখ্য পুঞ্জিভূত আবর্জনার অতল তলে মূল বিষয়টি চাপা দিয়ে মানবজাতিকে এক দুঃসহ দুঃখ ব্যথা ও ব্যর্থতা বঞ্চনায় জর্জরিত করে তুলেছে। পৃথিবী আজ এই দুই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার—পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র—নির্মমর্ম সর্বগ্রাসী নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বিশ্বমানব আজ এই উভয়ে প্রকার সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চায়, এক তৃতীয়—অর্থ-ব্যবস্থার সন্ধানে বিশ্বমানব আজ নিঃসীম ব্যাকুলতায় উদগ্রীব।আমাদের মতে বিশ্ব মানবের সঠিক কল্যাণ করতে পারে একমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা। অতঃপর দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে আমরা তাই পেশ করব।

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। আল-কুরআনে ইসলামকে বলা হয়েছে দ্বীন। ইসলাম মানব জীবনের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যা সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই ইসলাম সুষ্ঠু কাঠামো ও মঙ্গলময় বিধান পেশ করছে। মানবজীবনের কোনো দিকে বা পর্যায়ের কোনো সমস্যার সমাধান অন্যত্র খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন নেই, ইসলাম এর অনুমতিও দেয় না। ইসলাম প্রকৃতিসঙ্গত ও অকৃত্রিম কল্যাণময় জীবনবিধান। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামী অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র উৎস হচ্ছে আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা) প্রদর্শিত মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আল-ইসলাম, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতির একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি ইসলামী জীবনদর্শনে সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা।ইসলামী স্কলার ও অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ আকরাম খান তার বিখ্যাত গ্রন্থ .০An Introduction to Islamic Economics-এ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

"সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিত করণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। Islamic Economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of the earth on the basis of co-operation and participation.)"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম ওমর চাপড়ার মতে, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্পাপ্য সম্পদের বরবাদ ও বণ্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা অযথা ও সমষ্টি অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন রকম ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে। (Islamic Economics is that branch of knowledge which help to realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that i sin conformity with Islamic teaching without

unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances)।ইসলামী ব্যবস্থার কারণে অর্থসম্পদ কারো হাতে জমা থাকতে পারে না, বরং প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়ে গোটা সমাজের মানুষের প্রয়োজনে ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশনা হচ্ছে :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন,তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা । (সূরা হাশর ‘আয়াত:৫৯:৭)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদ আল্লাহর। মানুষ সেটি খোদায়ি বিধান মতে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণভাবে ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে সব নৈতিক মানদণ্ড কেন চলবে। ধোকা, প্রতারণা, মজুদারি,ওজনে কম দেওয়া সহ সুদ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থেকে মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

ধনসম্পদ উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায়ে অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তি লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ।

অন্যদিকে যে সব উপায় অবলম্বন করলে ধনসম্পদ উপার্জনের প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায় সঙ্গত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। কুরআন মাজিদের বিবৃত হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থ:হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (সূরা নিসা ‘আয়াত :৪:২৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

অর্থ: আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।(সূরা নিসা 'আয়াত:৪:৩০)

ইসলামী অর্থনীতিতে স্রষ্টাকে ভয় করত:সম্পর্কে মানুষের মাঝে দ্রুত চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ যেখানে বলে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় করো,সবার সঞ্চয় একত্র করো,পুঞ্জিভূত করো (ব্যাংকে), সেখানে আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।(সূরা আত তওবা :৩৪)

অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় বলে সঞ্চয় করো,অন্যটা বলে ব্যয় কর। সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে জাতির সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জিভূত করে। ইসলাম সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত তো করেই, রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত করতেও নিষেধ করে। কারণ একটা জাতির বা সমগ্র পৃথিবীতে সম্পদ যথাযথভাবে বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ব্যয় করা,সঞ্চয় নয়।

মানুষ একটি অর্থনৈতিক জীব মাত্র নয়, মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত'।এই পৃথিবীতে সত্যের, ন্যায়ের এবং পুণ্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করা আর অন্যায়, পাপ ও জুলুমের বিলোপ সাধন করাই মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। কুরআন মাজিদ স্পষ্ট ভাষায় ঘঘোষণা করেছে :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ: তোমরাই সর্বোত্তম জাতি,সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।তোমরা ন্যায়,সত্য ও পূর্ণময় কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়,পাপ ও মন্দ কাজ হতে লোকদেরকে বিরক্ত রাখো আর আল্লাহর প্রতি সূদৃঢ় বিশ্বাস রাখো। (সূরা আল ইমরান আয়াত:১১০)

ইসলাম মানব সমাজের শুধু বাহ্যিক সংশোধন-সংস্কার করেই ক্ষান্ত না — মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে উন্নত ও ক্রমবিকাশমানরূপে ঘরে তুলবার জন্য কেবল উহাকে যথেষ্ট মনে করে

না। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনের যতখানি সংস্কার বা সংশোধন করতে চায়, ব্যক্তি মন, চিন্তা ও জীবন সংশোধন করা কেউ ততখানে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। কারণ, ব্যক্তির মাঝে উন্নত, সততাপূর্ণ ও পবিত্র নৈতিক চরিত্র এবং মহান ভাবধারা সুপরিস্ফুট না হলে উন্নত ও আদর্শ সমাজ গঠিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সংস্কারকামী লোক সমাজের কেবল বাহ্যিক সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ করে তুলবার প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করে নাই। সমষ্টির ওপর একদেশদর্শী দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কারণে লোকদের ব্যক্তিগত জীবনকে তথায় উপেক্ষা করা হয়েছে। আর তারই ফলে সমগ্র মানব সমাজই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখ হতে বাধ্য হয়েছে। পাশ্চাত্য চিন্তা নায়কদের এটদদ যে এক মারাত্মক বিভ্রান্তি ও ক্রুটি এবং চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে চরম দৈন্যের প্রমাণ,তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ইসলাম এক চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা বলে উহার ওপর স্থাপিত রীতি-নীতি ও আদর্শ সমাজ-জীবন পুনর্গঠনের জন্য চিরকালীন মৌলিক ব্যবস্থা—তার কোনটি সাময়িক বা ক্ষণিক নয়। উদ্দেশ্য, নীতি ও লক্ষ্যই উহার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তা লাভ করার উপায় উপাদান ও সারসরঞ্জাম সম্পর্কে কোন স্থায়ী নির্দেশ কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,দ্বীন–ইসলামের দুশমনদের সাথে লড়াই সংগ্রাম করতে গিয়ে তাতে বন্দুক ব্যবহার করা হবে,না কামান,তীর ব্যবহার করতে হবে না তরবারি—ইসলাম সে সম্পর্কে কিছুই বলে নাই।

ইসলাম শুধু যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নিয়ম-নীতির উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অনুরূপভাবে ভূমি চাষের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করা হবে না,ট্রাক্টর;শিল্পোৎপাদনের জন্য হস্তচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হবে,না আধুনিক আবিষ্কৃত বিরাট যন্ত্রশক্তি,ইসলামে সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই। বরং জমি লাভ,কারখানার স্থাপন—এই উভয় ক্ষেত্রে ও উপায়ের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এই উভয় ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক-মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপন্ন ফসল ওপর নেট সুবিচারপুণ্য বন্টনের উপরই ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামের অর্থনীতি এই বিরাট ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অংশ মাত্র। কাজেই উহাকে এই পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে রেখেই বিচার করতে হবে:যখনই উহার আলোচনা-সমালোচনা বা সে সম্পর্কে গবেষণার সময় আসবে ইসলামের মূলগত ব্যবস্থা ও ভাবধারার সাথে মিলিয়েই তা করতে হবে। উহাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করতে গেলে মারাত্মক ভুল হওয়ার স্বাভাবিক। মূলত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা কে মানব জীবনের অন্যান্য অসংখ্য সমস্যা হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন মনে করা এবং সেই দৃষ্টিতে উহার সমাধান লাভের চেষ্টা করা যেমন বৈজ্ঞানিক ভুল,অনুরূপভাবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিরোধীও। এই পন্থা যারা অবলম্বন

করেছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তারা চরম অবৈজ্ঞানিকতার প্রমাণ দিয়েছে এবং ইসলামের নামে তারা ইসলাম বিরোধী অর্থনৈতিক মতাদর্শ উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছে। বস্তুত ইসলাম মানুষের সমাজ ও উহার পরিবেশের অন্তর্নিহিত গতি-প্রকৃতি এবং নিয়মকানুন বিশ্লেষণ করার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সৃষ্টিকর্তা যে উদ্দেশ্যে মানুষ ও সমাজ সৃষ্টি করেছেন, সমাজকে—ব্যাষ্টি এবং সামষ্টি উভয়কেই—সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পথ-নির্দেশ।এক কথায়,ইসলাম মানব-সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্লেষণের একটি বিশেষ তত্ত্ব এবং সমাজকে নির্বিশেষে সর্বসাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর রূপে গড়ে তোলার জন্য একটি সক্রিয় হাতিয়ার।

সর্বশেষ বলা যায়, ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি আদর্শিক অর্থব্যবস্থা। এর আদর্শিক চেতনা এ অর্থব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রাখে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে থাকে। কেননা এ অর্থব্যবস্থায় মানুষের জাগতিক কাজকর্ম, জীবন ধারণ, আয়-ব্যায়, উৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বণ্টন, সঞ্চয় সবকিছুর সমাধান দেয়া হয়েছে।

আধুনিক অর্থব্যবস্থা বিনিময় বা বিনিময় যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করে। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিনিময় অযোগ্য জিনিস নিয়েও আলোচনা করে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ড. এম. এ. মান্নান বলেন, ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু হচ্ছে গণমানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা যা ইসলামের আলোকে সমাধান যোগ্য।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ব্যাংক আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশেষ অবদান। আর সত্য কথা এই যে, ব্যাংকের বর্তমান রূপ ও সংগঠন পুঁজিবাদীদের শোষণ-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ার। ব্যাংকে সাধারণত দুই প্রকারের পুঁজি সংগৃহীত হয়ে থাকে, প্রথমত, অংশীদারদের দেওয়া পুঁজি এবং দ্বিতীয়ত, ধনীদের আমানতস্বরপ প্রদত্ত টাকা। আমানতস্বরূপ রক্ষিত টাকা তিন প্রকার। প্রথম, যা চাওয়া মাত্রই ফিরে পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় current deposit! দ্বিতীয়, যা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের নিকট অর্পণ করা হয়; এটা কে বলা হয় Fixed Deposit এবং তৃতীয় হচ্ছে Saving deposit; সপ্তাহে একবার এটার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ-ফিরিয়ে নেয়া যায়। ব্যাংক সংগৃহীত পুঁজির একাংশ নিজের নিকট সংরক্ষিত পুঁজি (Reserved capital) হিসাবে সব সময়ের জন্য জমা রেখে দেয়। উহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন ইহা হতে পূর্ণ করা হয়। ইহার পর কিছু পরিমাণ পুঁজি বাজারে (money marke) ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। এই পুঁজিও নগদ রিজার্ভ টাকার ন্যায় সকল সময়ই আদায়যোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য (liquid) হয়ে থাকে। এই পুঁজিতে শতকরা ২ এর ১ হতে এক টাকা পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। ব্যাংক পুঁজির একাংশ হুন্ডীর কারবারে এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বাবদ বিনিয়োগ করা হয়। এই পুঁজিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে পাওয়ার যোগ্য বলে এটাতেও সুদের পরিমাণ খুবই সামান্য। অতঃপর ব্যাংক-পুঁজির একটি বিরাট অংশ এমন সব কাজে লগ্নি করা হয় যাতে পুজির নিরাপত্তা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রয়োজন হলে তা বিক্রয় করেও মূল পুঁজি উদ্ধার করা যেতে পারে। এইরূপ অর্থ বিনিয়োগে শতকরা ২-৪ টাকা সুদও পাওয়া যায়। সরকারী সিকিউরিটি এবং কোম্পানীর অংশ ও রিবেঞ্চারস (Dedentures) ইত্যাদি এই শ্রেণীতেই পড়ে। নগদ রিজার্ভ পুঁজির পর ব্যাংক এই সব ক্ষেত্রেও পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। কারণ ব্যাংকের আত্মরক্ষা ও স্থিতিস্থাপনের জন্য এটা অপরিহার্য। এটার ফলেই ব্যাংকের মেরুদন্ড অধিকতর দৃঢ় হয়, বিপদের সময় এটা এর পৃষ্টপোষক হয়ে দাড়াতে পারে।ব্যাংকপুঁজির সর্বপ্রধান অংশ নিয়োগ করা হয় কারবারী ও ব্যবসায়ী লোকদেরকে এবং প্রতিপত্তিশালী বাক্তি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত ঋণ বাবদ। বস্তুত ব্যাংকের আমদানীর সর্বপ্রধান উপায় এটাই। এই ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে সুদ লাভ হয়ে থাকে। এই জন্য প্রত্যেকটি ব্যাংকই স্বীয় পুজির সর্বপ্রধান অংশ ব্যবসা- সংক্রান্ত কাজ কারবারে বিনিয়োগ করতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক ব্যাংকই সাধারণত শতকার ৩০ হতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজি এই কাজেই বিনিয়োগ করে থাকে।

মোট কথা, ব্যাংক আমানতদারদের নিকট হতে প্রাপ্ত এবং নিজেদের লগ্নিকৃত পুঁজি যথাযথভাবেই বিনিয়োগ ও ব্যয় করে, তা সবই সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। বস্তুত এই সুদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থানীয় সমাজের জনগণের নিকট হতেই আদায় করা হয় একং তাদের শ্রমার্জিত অর্থ সুদ বাবদ শোষিত হয়ে (জাতীয় সম্পদ) মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির নিকট

পুঞ্জীভূত হয়। আমানতকারীগণ সুদ-বাবদ যা পায় তা ঋণ-বাবদ লগ্নিকৃত অর্থের নির্দিষ্ট হারে আদায়ীকৃত সুদেরই অংশ মাত্র। ঋণ গ্রহণকারীদের নিকট হতে ব্যাংক উচ্চহারে সুদ আদায় করে এবং আমানতকারীদেরকে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত কম হারে সুদ দেয়। এইভাবে ব্যাংকের ভাগের সুদের অবশিষ্ট অংশ হতে ব্যাংকের যাবতীয় খরচপত্র নির্বাহ করা হয় এবং তার পরও যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তাই ব্যাংক ব্যবসায়ের মূল অংশীদারদের মধ্যে ঠিক সেই নিয়মেই বন্টন করা হয়, যেমন অংশীদার-ভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের লভ্যাংশ বন্টন করা হয় উহার অংশীদারদের মধ্যে।

বস্তুত ব্যাংক ছোট-বড় যত কাজই করে, সুদের বিনিময়ে টাকা খাটানোই হলো উহার আসল ও প্রধান কাজ। ব্যাংক সাধারণত নিজে কোন ব্যবসা করে না, ব্যবসায়ীদের জন্য সুদের বিনিময়ে পুজি যোগাড় করাই উহার দায়িত্ব। ব্যাংক নিজে কোন কারখানা খোলে না, বরং শিল্পোৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপনকারী লোকদের পুঁজি সংগ্রহ করে দেওয়া এবং তাদের নিকট হতে উচ্চহারে সুদ আদায় করা উহার কাজ।

এক্সচেঞ্জ ব্যাংকসমূহ সাধাণত বৈদেশিক পণ্য বা পুঁজি বিনিময়ের কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের কোন ব্যবসায়ী আমেরিকা হতে কোন পণ্য ক্রয় ও আমদানী করতে চাইলে কিংবা অন্য কোন কারণে মূলধন বিনিময় করতে ইচ্ছা করলে তাকে এই ব্যাংকের আশ্রয় নিতে হয়। একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় টাকা জমা দিলেই উহার মার্কিন মূল্যমান অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা উহার আমেরিকাস্থ শাখা কিংবা corespondent balance এর মারফতে পণ্য বিক্রয়কারী ফার্মে আদায় করা হয়। এই রূপ এক্সচেেরঞ্জ কাজ করে ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন লাভ করে থাকে। এছাড়াও হুন্ডীর বিনিময়ে এল, সি. খোলার মাধ্যমেও সুদ নিয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা এই যে, ব্যাংকের এই সমস্ত কাজে সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষেরই অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নাই।কিন্তু এই কল্যাণকর-আধুনিক যুগের এই অপরিহার্য-প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত যে কারণে কলুষিত ও সমষ্টিগতভাবে মানবসমাজের জন্য মারাত্মক হয়ে দাড়িয়েছে তা হলো সুদ। এই সুদ বন্ধ করে দিলেই এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ও গোটা মানবতার পক্ষে প্রকৃতভাবে কল্যাণকর হতে পারে।

আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থার মারাত্মক দোষ

বর্তমান যুগে সুসভ্য মানব-সমাজের জন্য ব্যাংক যেন একটি আত্যাবশকীয় ব্যবস্থা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক কাজই এমন রয়েছে, যা একমাত্র ব্যাংকের সাহায্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব। আর ব্যাংক না হলে তা সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাংকের সাহায্যে আনেক 'এজেন্সী সার্ভিস'ও সুস্পন্ন হয়ে থাকে। সমাজের অসংখ্য লোকের হাতে কম ও বেশী পরিমাণের যে পুজি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, তা এই ব্যাংকের মারফতেই একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে সামষ্টিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হতে পারে। কিন্তু এ সব অসংখ্য কল্যাণকর কাজ সম্পন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ইহা মানবতার মারাত্মক ক্ষতি করছে শুধু সুদ প্রথার কারণে।

ব্যাংকের মারফতে অসংখ্য হাতে বিক্ষিপ্ত পুঁজি এককেন্দ্রিক হয়ে তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। ব্যাংক পরিচালকরা এই পুঁজি জাতীয় স্বার্থের বিপরীত কাজে-দেশবাসীর নিকট অবশিষ্ট ধন-সম্পদ নিঃশেষে লুটে নেওয়ার জন্য-ব্যবহার করে। সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যাবস্থা যে সমাজে স্থাপিত হয়, তথায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব স্থাপিত না হয়ে পারে না। কারণ, পুঁজিবাদি সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুজির হাতেই কুক্ষিগত হয়। আর মুষ্টিমেয় ধনিকরাই হয় সেখানে সকল পুজির একচ্ছত্র মালিক।

এই ব্যাংকে অসংখ্য লোক টাকা জমা দেয় এ কথা ঠিক; কিন্তু জমা দেওয়া পর এই টাকার সাথে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের দেওয়া মূলধন কোন ধরনের কাজে বিনিয়োগকৃত হচ্ছে তা দিয়ে সমষ্টিগতভাবে দেশের কল্যাণ করা হচ্ছে কি অকল্যাণ; সে সম্পর্কে তাদের কিছুই বলার থাকে না। প্রতিশ্রুতি হারে প্রতি বৎসর সূদ আদায় করেই তারা সন্তুষ্ট। ফলে তাদের মূলধন প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের একবিন্দু কৌতূহল বা দরদ থাকার কথা নয়। এর লাভ লোকসান, উন্নতি-অবনতি কিংবা ভাল-মন্দের সাথে তাদের কোন নিকট সম্পর্কে আছে বলে তারা মনে করে না। কেননা তাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ হলেও তাদের অধিক হারে সুদ লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ নির্দিষ্ট হারের সুদই তাদের চূড়ন্ত মুনাফা। পক্ষান্তরে তাতে বিরাট কোন ক্ষতি হলেও তাদের কিছুই আসে যায় না, যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট সুদ সম্পর্কে পূর্বেই পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। বস্তুত যে সমাজে ব্যাষ্টির কল্যাণে সামগ্রিক কল্যাণ হয় বলে মনে করা হয় না, কিংবা সমষ্টির বিপর্যয়ে ব্যাষ্টিরও বিপর্যয় সংঘটিত হয় না, সে সমাজ কখনই মানুষের উপযোগী সমাজ হতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত না হয়ে

পারে না। এইরূপ মনোভাবে জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং সমাজের টাকা দ্বারাই সমাজের লোকদেরকে স্পর্ধার সাথে শোষণ করা হয়।

বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, এটার ফলে পণ্যদ্রবের মূল্য অত্যধিক উর্ধগতি ধারণ করে। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষ অনেক অলাভজনক কাজে মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহ পায়। শৈল্পিক কারবারে উন্নতি পরিলক্ষিত হলে ব্যাংক দুই হাতে ঋণ দিতে শুরু করে, নানাবিধ শিল্পোৎপাদনের কাজে অধিক সাহায্য দান করে। ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকও সুদের হার অত্যন্ত চড়া করে দেয়। কারণ, পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সময় অধিক পরিমাণ সুদ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যবসায়িক উন্নতির আশায় শিল্পপতি ও কারখানা মালিকগণ সুদের চড়া হারেও ঋণ নিতে প্রস্তুত হয়। ব্যাংক যখন অধিক ঋণ ইস্যু করেছে বলে মনে করে, তখন তা ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ফলে বিলিকৃত ঋণ ফিরে নেওয়া হয় এবং নূতন করে আর ঋণ দেওয়া হয় না। শিল্পের আর্থিক বুনিয়াদ যতই দৃঢ় এবং উহার যতই সুনাম হোক না কেন, সহসা ঋণ শোধ করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। তখন মূলধন স্বল্পায়তন ও হ্রাস করার একটা Depression ধারা চলতে থাকে। ছাঁটাই ও উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস করার ফলে বেকার সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিদারুন মন্দা দেখা দেয়।

বস্তুত ব্যাংকের নিকট শিল্পের স্বর্থ অপেক্ষা নিজের লাভ-লোকসানের স্বার্থটাই অধিক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মূল শিল্পে ব্যাংকের কোনই অংশ নাই, ব্যাংক ঋণদাতা মাত্র। কাজেই শিল্পের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে উহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল থাকার কথা নয়। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার এই মূলীভূত দোষ বর্তমানে খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এইজন্য শিল্প-ব্যবসায়ে অগ্রসর ও উন্নত দেশসমূহ শিল্প ও ব্যবসায়ের পারস্পরিক নিবিড় যোগাযোগ ও নিকট সম্পর্কে স্থাপনের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কারণ, তা না হলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানকালে সুদভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থায় ব্যাংকের সাথে উক্তরূপ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য ব্যাংক যেখানে কেবল ঋণ দানেরই কাজ করবে না; বরং উহার মূল ব্যবসায়ের অংশীদারও হবে, একমাত্র সেখানেই এবং এইভাবেই ব্যবসায়ের সাথে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ইসলামি স্বর্ণযুগ ৬২২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি অর্থনীতির সূচনা হয় মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফত আমলে হজরত আবু উবায়দাহ (রা.)-কে এর নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ করা হয়। হজরত ওমর (রা.)-এর যুগে বায়তুল মালে প্রাচুর্য দেখা দেয়। আধুনিক ইসলামি ব্যাংক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনেক কিছুই সেই বায়তুল মালের অনুসরণেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। বায়তুল মাল মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে। বায়তুল মালের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা, মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা প্রচলনের মঞ্জুরি দান ও মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা হতো। জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিনা লাভে ঋণ প্রদান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ সরবরাহ করা হতো। আব্বাসীয় খিলাফতের (৭৫০-১৫১৭) যুগে সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো ইসলামি শরিয়াহ্ আইনের ভিত্তিতে। সেই সময় ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে প্রভূত আর্থিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ এক হাজার ৩০০ বছর ইসলামি সাম্রাজ্যে সুদ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। বরং সুদ ছাড়াই মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। আব্বাসীয়দের পর আসে উসমানীয় খেলাফত, যার পতন হয় ১৯২২ সালে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সারাবিশ্বে ইসলামের নবজাগরণের সূচনা হয়। এ সময় মুসলমানদের মাঝে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু তত দিনে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সারাবিশ্বকে গ্রাস করেছে। ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সে হিসেবে ইসলাম সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আর্দশ অর্থনীতির প্রবর্তন করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার। রেনেসাঁ ছিল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সংঘটিত ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণের মধ্যবর্তী সময়। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্যাংক অব বার্সিলোনা’ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যাংকের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রথম ইসলামি ব্যাংকিংয়ে যাত্রা গত শতকের ষাটের দশকে। আধুনিক ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নতিতে অবদান রাখে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। ব্যাংকিং সুদ মূলত ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের পর আবিষ্কৃত হয়। মূলত সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ইহুদিদের প্রবর্তিত একটি পদ্ধতি। সুদ যে শোষণের জাঁতাকল, তা সর্বজনবিদিত। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। অর্থাৎ ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয়। যে পক্ষ টাকা জমা রাখে, তাকে সুদ প্রদান করে এবং যে পক্ষকে ঋণ দেয়, তার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ গ্রহণ করে। এই বেশি সুদ ব্যাংকের মুনাফা। দেখা যায়, ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে। লাভ-ক্ষতির তোয়াক্কা না

করে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি টাকা নেয়াকে সুদ বলে।ইসলামে সুদ দুই প্রকার, একটা হচ্ছে সময়ের সুদ বা রিবা আল নাসিয়া। অন্যটি হলো পণ্যের সুদ বা রিবা আল ফাদল।

ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো শিল্প ও ব্যবসায় অর্থের জোগান দেয়া। ব্যাংক আধুনিক সভ্যতা লালিত নানা ধরনের বস্তুর মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বস্তু। ব্যাংকিং ছাড়া আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। ব্যাংকে সামান্যতম কমিশন দেয়ার মাধ্যমে আজকের আধুনিক যুগে একজন অতিব্যস্ত ব্যক্তি বহু রকমের সেবা পেয়ে থাকে।ব্যাংকিংয়ের এসব কল্যাণ ও সুফলকে বিশ্বমানবতার জন্য অকল্যাণ, অন্যায়, অনিষ্ঠ ও বিপর্যয়ে পরিণত করেছে যে বস্তুটি, তা হচ্ছে সুদ। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও চড়া মূল্যের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

আল কুরআনের নির্দেশনা

ইসলামি ব্যাংকিং নিতান্তই একটি ব্যবসা। আল-কোরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে করেছেন হারাম।

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ: "অথচ আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন"।(সুরা বাকারা: ২৭৫)

আল্লাহ কোরআনে 'আল-বাই' বা বাণিজ্য বা ট্রেডের কথা উল্লেখ করেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না।' (সুরা নিসা-২৯)

কোরআনে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে রিবা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল-কোরআনের চারটি সুরার মোট ১৫টি আয়াতকে রিবা-সংক্রান্ত আয়াত বলা হয়। অনেক তাফসিরকারকের মতে, কোরআনে সর্বমোট ২০টি আয়াতে রিবার উল্লেখ রয়েছে। যদিও এই ২০টি আয়াতের সবগুলোতেই শব্দগতভাবে সরাসবি এর উল্লেখ নেই, তবে আটবার উল্লেখিত হয়েছে, সুরাবাকারায় পাঁচবার (২৭৫, ২৭৬ ও ২৭৮), আল-ইমরানের ১৩০, নিসার ১৬১ এবং আর-রুমের ৩০নং আয়াতে একবার করে। চারটি সুরায় সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা রয়েছে। অষ্টম হিজরিতে সুরা বাকারার রিবা-সম্পর্কিত আয়াতগুলো নাজিল হয়। নাজিলের ক্রমিক ধারা অনুসারে সুরার নাম ও আয়াত নম্বরগুলো হলো:

প্রথম পর্যায়: সর্বপ্রথম সুদের নিন্দা জানিয়ে সুরা রুম-৩৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ

অর্থ: 'তোমরা যেসব সুদ প্রদান করো মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, তা আল্লাহর কাছে বাড়বে না।'

দ্বিতীয় পর্যায়: সুদের কারণে আগের উম্মতের ওপর আরোপিত আজাবের কথা বলা হয়েছে সুরা নিসার ১৬০ আয়াতে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

অর্থ: 'আমি ইহুদিদের জুলুমের কারণে তাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু বৈধ ছিল, তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি এবং তারা অনেককে আল্লাহর পথ থেকে প্রতিরোধ করত এবং তারা সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করত।' (সুরা নিসা-১৬০)

তৃতীয় পর্যায়: চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সুরা আল-ইমরানের ১৩০নং আয়াতে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা, তোমরা দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।'(সুরা আল-ইমরান-১৩০)

চতুর্থ পর্যায়: চূড়ান্তভাবে দশম হিজরিতে সুদ হারাম করা হয়েছে সুরা বাকারার ২৭৮নং আয়াত নাজিলের মাধ্যমে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

অর্থ: 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে সুদের মধ্যে যা বাকি আছে তা বর্জন করো। কিন্তু যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' (সুরা বাকারা-২৭৮)

হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিদায় হজের সময় চূড়ান্তভাবে তা হারামের ঘোষণা দেন।

সুদের উৎস হলো ঋণ। ব্যাংক সুদ হলো ঋণ থেকে পাওয়া অতিরিক্ত অর্থ, যা ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে দিয়ে থাকে। সুদ বর্জন করে ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক কীভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ সাধন করা যায়, সে বিষয়ে আল-কোরআনে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।সুরা বাকারার ২৮২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখো। তারপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে এর সাক্ষী রাখো।' সুরা বাকারার ২৮৩নং আয়াতে রয়েছে, 'যদি তোমরা সফরে থাকো এবং দলিল লেখার জন্য কোনো লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো।'

সুরা বাকারার ২৮০নং আয়াতে রয়েছে,

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ: ‘তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি দান করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা অনুধাবন করো।’

সুরা আ’রাফের ৮৫নং আয়াতে রয়েছে,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

অর্থ: ...'সুতরাং ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করে দাও।’

সুদ সম্পর্কিত হাদিস

১| সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সাঃ) সুদ দাতা ও সুদ গ্রহিতা উভয়ের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন"(মুসলিম,আবু সাহাবী দাউদ,তিরমিজি,ইবনে মাজাহ)

২|সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুল (সাঃ) সুদ দাতা,সুদ গ্রহিতা সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী-সকলের ওপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী"। (মুসলিম)

৩|সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সাঃ)বলেছেন, "তোমরা সাতটি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করবে"।তার মধ্যে তৃতীয়টি হল সুদ খাওয়া। (বুখারী,মুসলিম,আবু দাউদ,নাসায়ী)

৪|সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন, "কবিরা গুনাহ সাত প্রকার। তন্মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ খাওয়া"।(মাসনাদে বাজ্জারে)

৫|হযরত আওন বিন আবি জুহাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূল (সাঃ) সুদখোর ওষুধ প্রদানকারীর উপর লানত দিয়েছেন"। (বুখারী,আবু দাউদ)

৬। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চার শ্রেনীর লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ফয়সলা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না আর না সেখানকার কোন নিয়ামতের স্বাদ তারা আস্বাদন করবে। তারা হলো (১) মদ্যপানে আসক্ত, (২) সুদখোর, (৩) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (হাকেম)

৭। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সুদের ৭৩ টি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সাথে জেনায় (ব্যাভিচারে) লিপ্ত হওয়ার সমান"। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাকেম)

সুদ সম্পর্কীয় গুনাহকে মায়ের সাথে জেনার সঙ্গে তুলনা বিষয়ক হাদিস অত্যন্ত মাশহুর বা সুপরিচিত। বহু সাহাবী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) (বায়হাকী), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) (তাবরানী), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (বায়হাকী), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)।

৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "সুদী খাতে কোনো মানুষ যদি এক দিরহামও গ্রহন করে, তাহলে তার অপরাধ ইসলাম গ্রহনের পর মুসলিম থাকা অবস্থায় ৩৩ বার ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক"। (তাবরানী)

একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন-হযরত কা'বুল আহবার (রাঃ) (মাসনাদে আহমদ), আব্দুল্লাহ বিন হানজালা (রাঃ) ওহুদ শহীদ (মাসনাদে আহমদ), হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) (বায়হাকী), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (তাবরানী)।

৯। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, “সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও"। (তাবরানী)

১০। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তুমি এমন গুনাহ্ থেকে সর্বদাই আত্মরক্ষা করবে যা কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না"। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো, "সুদখোর। যে ব্যক্তি সুদ খায়, সে হাশরের ময়দানে দিক-বিদিক জ্ঞানশূণ্য মাতাল অবস্থায় উত্থিত হবে। (তাবরানী)

১১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "অবশ্য অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগে পৌঁছবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না-যে সুদী কারবারের সাথে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো না কোনো উপায়ে) জড়িত থাকবে না। যদি কোনো লোক সুদের পরশ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তার জন্য তা হবে অসম্ভব প্রয়াস"। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

১২। হয়রত ইবন মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদ প্রদানকারীর সাথী এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোন সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল এবং তা গ্রহন করল তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজা সমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম

আধুনিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আল্লাহর কিতাব আল-কোরআন, রাসুল (সা.)-এর হাদিস, সাহাবিদের বাস্তব প্রয়োগ এবং যুগে যুগে ইসলামি চিন্তাবিদদের গবেষণাপ্রসূত ইসলামি আইন দ্বারা গঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসা হলো পণ্য বা সেবার কেনাবেচা, সম্পদের ভাড়া খাটানো এবং কমিশনের বিনিময়ে সেবা প্রদান। ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে অর্জিত অর্থ-সম্পদকে মুনাফা বলে। ব্যবসার ফলে উভয়পক্ষের যে মার্জিনাল ইউটিলিটি বৃদ্ধি পায়, তা-ই হচ্ছে মুনাফা। টাকার ওপর সুদ হয়, কিন্তু মুনাফা হয় ব্যবসা থেকে। ইসলাম সুদ ও মুনাফার পার্থক্য করেছে। সুদ একতরফা লাভের কথা বলে, কিন্তু ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হয়। কল্যাণ বাড়ানো ও অকল্যাণ দূর করা ইসলামি শরিয়াহ্র মাকাসিদ বা লক্ষ্য। জনগণের অবারিত কল্যাণ সাধন ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্য।

ইসলামি ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে এবং ইসলামি ফকিহ্গণ কর্তৃক প্রণীত মুদারাবা, মুশারাকা, আকদে ইজারা, আকদে ইসতিসনা, বাইয়ে সালাম, বাইয়ে মুরাবাহাসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধিতির মাধ্যমে বিনিয়োগ করে। ইসলামি অর্থনীতির মূল বিষয় হলো উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ করা। আর উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির সুযোগও কমে যায়, যে মূল্যস্ফীতি দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিনিয়োগের ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা আরোপের কোনো সুযোগ নেই। কোনো ব্যক্তি বৈধ উপায়ে যে ধন-সম্পদ উপার্জন করে, তার ওপর ইসলাম ব্যক্তির স্বত্বাধিকার অবশ্যই স্বীকার করে; কিন্তু উপার্জিত ধন-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি। বরং তার ওপর বিভিন্নভাবেবিধিনিষেধ আরোপ করেছে। উপার্জিত ধন-সম্পদ ব্যবহার করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো এক. খরচ বা ব্যয় করা; দুই. লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা এবং তিন. মজুত করা।

এক হাজার ৪৪২ বছর আগে অর্থনৈতিক মুক্তির দিশা হিসেবে আল-কোরআনে সুদকে হারাম করা হলেও সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা না থাকায় শত শত বছর ধরে মুসলমানরা সুদের সংস্রব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি শোষণমুক্ত ও কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির জন্য জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল যুগে ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলস্বরূপ প্রক্রিয়াগত দিক থেকে শরিয়াহ্‌সম্মত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও শোষণের মাত্রার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় খুব বেশি তফাত নেই। তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে অনেক এগিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলো। যেদিন সামগ্রিক আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা শরিয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত হবে, সেদিন পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধিত হবে। সুদ থেকে বাঁচতে হলে ব্যবসাতে যুক্ত হতে হবে। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু এর বিকল্প হিসেবে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সুদমুক্ত হালাল উপার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ মোতাবেক আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করাই কাম্য। বিশ্বায়নের যুগে কভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক মন্দার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো শরিয়াহ্‌ আলোকে গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

যানবাহন ও আমদানি-রপতানির সাহায্যে জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য পণ্যদ্রব্য বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্রে পৌঁছায়। ব্যবসায়ী তা ক্রয় করে পুনরায় অন্যত্র বা অন্যভাবে বিক্রি করতে চেষ্টা করে। কাজেই অর্থোৎপাদনের অন্যান্য অসংখ্য উপায়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও একটি অন্যতম উপায়। ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোৎপাদনের জন্য কুরআন মজীদ যথেষ্ট উৎসাহ দান করেছে। বলা হয়েছেঃ

فاذا قضيت الصَّلوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعه١٠ -

অর্থ: অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাহায্যে অর্থোপার্জন করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত আয়াতে। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الأَأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء - ٢٩)

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।

নবী করীম (স) মুসলমানদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ইসলামী সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পন্থী ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّقِينَ وَاشْهَدَاءِ(ترمذى(

অর্থ: সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।।

এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতি ব্যবসায়-বাণিজ্যের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এটা একদিকে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, অপরদিকে এটা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে সুদৃঢ় ও উন্নত করে তোলে, অন্য কথায়, এটা মানুষের খোদাভীতি (তাকওয়া) ও নৈতিক চরিত্রের এক কঠোর পরীক্ষা-ক্ষেত্র।

কালামে পাকে বলা হয়েছেঃ

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبوا

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করেছেন, কিন্তু সূদ ও সূদভিত্তিক যাবতীয় কারবার হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।(সূরা বাকারা ২৭৫)

নবী করীম (স) বলেছেনঃ

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ — كنز العمال

অর্থ: রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে।
বস্তুত জাতীয় জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিরাট স্তম্ভ বিশেষ; তাই বলা হয়েছেঃ

لَوْلا هَذِهِ الْبُيُوعُ الصِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ— كنز العمال

অর্থ: ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই ব্যবস্থা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিসহ ও অপরের উপর দুর্বহ বোঝা হয়ে পড়ত।

হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথেই ব্যয়

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, ভোগ, বন্টন, উৎপাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউই স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যে সমস্ত বিষয় শরীয়াহর দৃষ্টিতে হালাল বা বৈধ সেসবের উৎপাদন ভোগ বন্টন ও সেসব উপায়ে উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম চালিকা শক্তি হলো আমর বিল মারুফ বা সৎকাজে আদেশ অর্থাৎ, সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং নেহী আনিল মুনকারবা অসৎ কাজে নিষেধ অর্থাৎ দুর্নীতির উচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অর্থ: "তারা (মুমিন মুসলমান) এমন ভাল লোক যে যদি আমি (আল্লাহ) তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজ করতে নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখে।" (সূরা আল-হজ্জ: ৪১ আয়াত)
আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

অর্থ: "মুমিন নর-নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধুন। তারা ভাল কাজের উপদেশ দেয এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে।" (সূরা আত্-তাওবা: ৭১ আয়াত)
হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের পছন্দসই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায় ও পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলামী অর্থনীতিতে সে সুযোগ কারো জন্যেই উন্মুক্ত থাকে না। যেসব সামগ্রীর ভোগ নিষিদ্ধ সেসবের উৎপাদন বিপণন ও বাণিজ্যও নিষিদ্ধ।সুদ যেমন নিষিদ্ধ মদ জুয়াও তেমনি নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে অনৈসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে ইসলাম বহির্ভূত সকল মতাদর্শ বা ইজমাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন ভোগ বন্টন উৎপাদন বিনিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই বৈধ বিচার বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে বা উপযুক্ত ট্যাক্স দিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত নির্ধারিত কর ফি শুল্ক ইত্যাদি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন পরিমাণ আয়ই বৈধ গণ্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ভোগ বন্টন উপার্জন বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন শেষ সীমা বা নীত-নৈতিকতার প্রশ্ন নেই। ভোগবাদী এই ব্যবস্থায় যেসব পন্থায় উৎপাদন বা যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রেরও অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের স্বাধীনতা বিনিয়োগ ও বন্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্র দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখন অবশ্য সেই অবস্থা আর নেই। পুঁজিবাদের বিলাসী জীবন ও ইন্দ্রিয় আসক্তির মোহের জোয়ারে সমাজতন্ত্র ভেসে গেছে। ইসলাম এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করে না। বরং ইসলামের দাবীই হলো অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে শরীয়াহর বিধান মান্য করা। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা হারাম বা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।
অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জন, বন্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।
প্রথমতঃ অবৈধ উপায়ে আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুলুম চালানো হয়।
দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রমসমূহ এসব অবৈধ বা হারাম অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফসল।
এবং তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন সম্পদ সাধারণতঃ অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন

আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উপরেই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। বস্তুতঃ সমাজে কি ধরনের অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে আয় ও সম্পদ বন্টন সুষ্ঠু হবে, না বৈষম্যপূর্ণ হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সমাজে আয় ও ধনবন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আকিদা মুতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই এর স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। এখানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয় ও ভোগের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ব্যয়েরও সুযোগ নেই। এই মূল দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসের সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।” (সূরা আন্ নিসা: ২৯ আয়াত)

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

অর্থ: “সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।” (সূরা আল-হাশর: ৭ আয়াত)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ

অর্থ: “নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।” (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৭ আয়াত)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: “তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।” (সূরা আল-যারিয়াত: ১৯ আয়াত)

সুতরাং, ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার আলোকেই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

আল কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: তোমার সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে,তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন। (সূরা বাকারা-১১০)

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বন্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব,মিসকিন,ঋণগ্রস্ত মুসাফির,ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্র, মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম বিশ্বে আজ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদূন (রা) ও তাদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটা দপ্তর ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্যে। রাসূলে করীমের (স) মৃত্যুর পর বিরাজমান দুঃসময়ে মিথ্যা বনী দাবীকারীদের বিদ্রোহীদের মুখেও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- “যদি কারও কাছে উট বাধার রশি পরিমাণ যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।” এই ঘোষণার সুফল পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই। গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হলো সেদিনের আরবে সর্বহারা শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

উশরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় গ্রামীন জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্রের মাত্রাও হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থায় কৃষি পণ্যের আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হয়। এই পদ্ধতি এজন্যেই আরও উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। আজকের খাজনা ব্যবস্থায় বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের প্রদেয় খাজনা ও উৎপন্নের সঙ্গে ব্যবধান রয়েছে দুস্তর। পক্ষান্তরে উশর আদায় পদ্ধতিতে প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদে চাষী এমনকি বর্গচাষীরাও রেহাই পায় সঙ্গতঃ কারণেই। এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই নিশ্চিত হয়।

বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত অর্থ-সম্পদই বায়তুল মাল হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। অর্থাগমের উৎস ও ব্যবহার বিধির বিচারে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অর্থ সম্পদের উপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-এলাকা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত না হয় সেজন্যে বায়তুল মালহতেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। রাসূলে করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদূন (রা) একে আরও সুসংহত করেছিলেন।

বায়তুল মালের অর্থ যেসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্যে নির্দেশ রয়েছে সেগুলো হলো;

১. সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন;

২. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ;

৩. ইয়াতীম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন;

৪. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান;

৫. জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ;

৬. করযে হাসানা প্রদান; এবং

৭. দারিদ্র বিমোচন ও সমাজকল্যাণ।

বায়তুল মালহতে কোনক্রমেই অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বা শাসকের ভোগ-বিলাসের জন্যে ব্যয় করার বিধান নেই। অথচ আজ একদিকে বনি আদম ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায়, শীতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে, অন্য দিকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা জনগণের দেওয়া টাকায় ভোগ-বিলাসে যা ভাসিয়ে দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি এর প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। খলীফা হযরত উমার (রা), তাঁর গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলমের নিব সরু করে নিতে আর কাগজের মার্জিনেও লিখতে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারী অর্থের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। অথচ আজ সরকারী অর্থ তছরূপের পাশাপাশি অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলেছে। এর প্রতিবিধানকল্পে আক্ষরিক অর্থেই বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে জনগণের তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ অবশ্যই বাধ্যতামূলক হতে হবে যেমন ছিল খুলাফায়ে রাশেদার (রা) যুগে।

ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন

আজকের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দুশ বছরের বেশী সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকা শক্তি। সুদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুদের মারাত্মক যেসব অর্থনৈতিক কুফল ইতিমধ্যেই ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেসব রীতিমত ভীতিপ্রদ। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে;
২. সামাজিক শোষণ বিস্তৃত, ব্যাপক ও অব্যাহত থাকে;
৩. ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়;
৪. মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পূঞ্জীভূত হয়;
৫. সম্পন্ন ও সচ্ছল কৃষকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে পরিণামে ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হয়;
৬. একচেটিয়া কারবারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে;
৭. সুদের হার কখনও স্থির থাকে না, ক্রমেই এইহার বেড়ে যায়, ফলে শোষণের মাত্রাও বাড়ে;
৮. ব্যবসায় চক্র (Business Cycle) সুদেরই সৃষ্টি যার ফলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ও সুস্থ বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়;
৯. সমাজে বিলাসপ্রিয়, অকর্মণ্য ও ভোগী লোকের সৃষ্টি হয়;
১০. কর্মসংস্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়, সুলভে মূলধন না পাওয়ার বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগে ভাটা পড়ে;
১১. মজুদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সুদ অন্যতম প্রতিবন্ধক;
১২. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলাপী ঋণের বিপুল বোঝা শেষ অবধি জনসাধারণের কাঁধেই চাপে;
১৩. জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে;
‘৪. বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায় সুদের কারণেই;
১৫. অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মুখ্য কারণ সুদ; এবং
১৬. অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকও সুদ।

এসব কারণেই রাসূলে করীম (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুদ উচ্ছেদের জন্যে জিহাদ করে গেছেন। বর্তমান সময়ে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে অন্যতম প্রধান কাজ হবে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আলহামদুলিল্লাহ। বিগত ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশে তো বটেই, এমনকি অমুসলিম দেশেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সফলতার সাথে চালূ হয়েছে। সুদভিত্তিক

ব্যাংকগুলোর বিপরীতে এই ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করে চলেছে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। তাই ইসরামী অর্থনীতি চালু করতে হলে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন একেবারে অপরিহার্য কর্মসূচীর পর্যায়ে পড়ে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াহর আলোকে হালাল-হারামের পার্থক্য অনুসরণ, অংশীদারীত্বমূলক অংশগ্রহণ, শরীয়াহ বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, যাকাত আদায় করা, লাভ-ক্ষতির অংশীদারীত্বের শর্তে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা এই ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।
বীমার ক্ষেত্রেও ইসলামী পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কারণ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অতি অবশ্যই ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মানুষ তার ব্যবসায়ের, নিজের জীবনের ও পণ্যের নিরাপত্তা চায়। নিরাপত্তার এই প্রয়োজনকে কেনদ্র করে গড়ে উঠেছে সুদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা। এই অবস্থার অবসানকল্পে গড়ে উঠেছে শরীয়াহসম্মত ইসলামী বীমা বাতাকাফুল কোম্পানী।

করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে করযে হাসানা ও মুদারিবাত অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে এ ছিল সমকালীন অর্থনীতিতে এক বলিষ্ঠ ও ভিন্নতর পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বৈপ্লবিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাসূলে করীমের (স) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরের বেশী এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য।
ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, কৃষিকাজের জন্যে সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে করযে হাসানা নেবার প্রথা চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু হতে। এজন্যে সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিগণ মন-মানসিকতার দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া বায়তুল মাল হতেও করযে হাসানা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্তক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে বলেন-

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

অর্থ: “কে সেই লোক যে আল্লাহ তায়ালাকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত আছে? কেউ যদি দেয় তবে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।” (সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৪৫ আয়াত)

মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য অবদান। মুদারিবাতের গুরুত্ব এজন্যে যে, এই পদ্ধতিতে ব্রবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অংশ বা হার অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু মুনাফা না হলে কেউ কিছু পাবে না। যদি কোন কারণে লোকসান হয় তাহলে তা বহন করবে সাহিব আল-মাল বা মূলধন বিনোগকারী। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, কল-কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে মূলধনের সংকট হ্রাস পাবে। ফলে সুদী ব্যাংক ও পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যাবে। সম্প্রতিককালে মুসলিম, এমন কি অমুসলিম দেশে পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে মূলতঃ এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই। তবুও ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে সাধারণভাবে করযে হাসানা ও মুদারিবাতের সুযোগ থাকা আবশ্যক।

ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ

শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই ভাই—এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্র। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" –শোলাগনসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এখানে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি জমির মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে;

২. মৌলিক মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিকক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে;

৩. কাজে নিযুক্তির পূর্বে শ্রমিকের সাথে যথারীতি চুক্তি হবে এবং তা যথাসময়ে পালিত হবে;

৪. শ্রমিকের অসাধ্য কাজ তার উপর চাপানো যাবে না;

৫. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নীচে মজুরী নির্ধারিত হবে না;

৬. উৎপন্ন দ্রব্রের অংশবিশেষ অথবা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের দিতে হবে;

৭. পেশা বা কাজ নির্বাচন ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কে দর-দস্তর করার পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রমিকের থাকবে;

৮. অনিবার্য কারণ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনার প্রেক্ষিতে কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে শ্রমিকের উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করা চলবে না;

৯. মালিকপক্ষ দুর্ঘটনা ও ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে;

১০. দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;

১১. অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের জন্যে উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে;

১২. পেশা পরিবর্তনেরঅধিকার শ্রমিকের থাকবে;
১৩. পরিবার গঠনেরও অধিকার তার থাকবে;
১৪. স্বাধীনতভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের অধিকার থাকবে;
১৫. শ্রমিকের স্থানান্তরে গমনের অধিকার থাকবে; এবং
১৬. শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এই নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসরামী অর্থনীতিতে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য কোন অর্থনীতিতে এই ধরনের নীতিমালা অনুসরণ তো দূরের কথা, এই জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বা গ্রহণেরই প্রশ্ন ওঠে না। ইসলামী অর্থনীতির সাথে এখানেই অন্যান্য অর্থনীতির মৌলিক তফাৎ।

ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষি বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পায় তখন বহু বড় শিল্পপতি হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। নব্য জমিদাররা বহু ক্ষেত্রেই শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। কৃষি কাজে জমির পূর্ণ ব্যবহারে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে বহু দেশেই। একই সঙ্গে ব্যারণ লর্ড মার্কুইস পীয়র মনসবদার জমিদার জায়গীরদার তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদের শোষণ বাড়তে থাকে।

এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, ব্যক্তিকে জমি থেকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। বন্দী শিবিরদের কনসেনট্রেন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে আরও বহু সহস্রকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। মালিকানা বঞ্চিত কৃষকদের রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারে জবরদস্তি করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে তাদের ভরণ-পোষণের ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি।

এই উভয় প্রকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাবরোধী। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্ট না হয় সেজন্যে ইসলাম তার অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিল। আল-কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

অর্থ: "জমি আল্লাহ তায়ালার। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারত্ব দান করে থাকেন।" (সূরা আল-আরাফ: ১২৮ আয়াত)

ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি ভূমি মালিকের সম্পর্ক। কোন প্রকার মধ্যস্বত্বের অবকাশ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ পংগু অসুস্থ শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা নিজে চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীমের (স) নির্দেশ হচ্ছে-

"যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।" (ইবনে মাজাহ)

"যে লোক পোড়ো অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।" (আবু দাউদ)

আজ কিছু দেশ প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনার জন্যে অপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে ফসলের দাম কমে যাবার ভয়ে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। এর প্রতিরোধের জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত না রাখতে ইসলামে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ইসলাম।

উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন

মানবতার মুক্তিদূত মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার (স) আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। কোন কোন দর্মে পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। হিন্দু ধর্মে চালু ছিল যৌথ পরিবার প্রথা। এই প্রথা দুটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ছিল হিন্দু, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মের। কেননা সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে না বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে যারা অর্থ বলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হবে। এরাই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়।

এটা প্রতিরোধের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল্-কুরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন (দ্রষ্টব্য: সূরা আন্-নিসা ১১-১২ আয়াত)। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই আইন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে না। ছলে-বলে-কৌশলে ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধুদের, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের, বোনদের, খালা-ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এর প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত সমাজে যুলুম ও বঞ্চনা চলতেই থাকবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয়ে রইবে হাজার হাজার বনি আদম। এই অবস্থা নিরসনের জন্যে ইসলামী মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয় তার সঠিক প্রেক্ষিতেই।

ব্যবসায়িক অসাধুতা ও সব ধরনের জুয়া উচ্ছেদ

সকল প্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয় নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেশের সরকার খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ব্যবসায়ীরা হয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করে অথবা দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। কোন কোন দেশে তাে ব্যবসায়ীরা অবৈধ সুযোগ লাভের জন্যে সরকারকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে থাকে অথবা মোটা অংকের ঘুষ দেয়। অবস্থার আজ এতদূর অবনতি হয়েছে যে কয়েকটি দেশে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়ীরা রীতিমতো ছোট-খাট সেনাবাহিনী পুষে থাকে এবং সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। ইসলামে মাদক দ্রব্য ও নেশার সামগ্রীর ব্যবসায় শুধু নিষিদ্ধ নয় বরং চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরীও নিষিদ্ধ। ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি জঘন্য ধরনের অপরাধ। মজুতদারীর মাধ্যমে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয় এবং হেন বস্তু নেই যা ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই মজুত কেরে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনগণের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বারবার। ব্যবসায়িক অসাধুতার ফলেই জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে নিদারুণ দুর্ভোগ। এমকি বুলেটের আঘাতে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সরকারের রাজস্ব হ্রাস পায়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

অর্থ: "যারা ওজনে কম দেয়, পরের জিনিস ওজন করে নিলে পুরো গ্রহণ করে কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয় তখন পরিমাণে কমদেয় এরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১-৩ আয়াত)

মজুতদারী থেকে ক্রমেই মুনাফাখোরীর মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। উপরন্তু একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে চোরাকারবার ও কালোবাজারের যোগফল যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে তলাহীন পাত্রের মতো করে ফেলতে সক্ষম। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে সব ধনের ব্যবসায়িক অসাধুতা শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং যারা এসব গণস্বার্থবিরোধী ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কাজে লিপ্ত তাদের সমুচিত শাস্তিরও বিধান রয়েছে। কেননা কেবলমাত্র এভাবেই আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে জুয়াকে তার সর্ববিধ রূপে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্র হতে এর উচ্ছেদ না হলে ইসলামী অর্থনীতি তার প্রকৃত কল্যাণকর্মী রূপ বাস্তবায়নে পুরোপুরি সমর্থ হবে না। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! জেনে রাখ, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।" (সূরা আল মায়েদা: ৯০ আয়াত)

মূখ্যতঃ তিনটি কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে সব রকমের জুয়া ও ফটকাবাজী (Speculation) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ জুয়ার কারণে প্রভূত অর্থের অপচয় ও মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ জুয়া সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈতিক অপরাধের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র জুয়ার কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ, মারামারি এবং খুন-জখম সংঘটিত হচ্ছে এরকম উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি।

তৃতীয়তঃ জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোককে প্রতারণা করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে দেয়।

সুতরাং, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই ইসলামেরসকল ব্যবসায়িক অসাধুতা নিষিদ্ধ ও সব ধরনের জুয়া উচ্ছেদের জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নেহী আনিল মুনকারের এই নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতেরও কল্যাণ ও নাযাতও নিশ্চিত করে।

ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার এবং আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারুফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও 'মুনাফা' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুনীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং একই সঙ্গে আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। রাষ্ট্র এই উপায়েই সুদ ঘুষ মুনাফাখোরী মজুতদারী চোরাচালানী কালোবাজারী পণ্যদ্রব্য আত্মসাৎ সব ধরনের জুয়া হারাম সামগ্রীর উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সকল প্রকারের অসাধুতা প্রভৃতি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল নিপীড়ন ও শোষণমুলক কাজ সমূলে উৎপাটন করতে পারে।অনুরূপভাবে যে সমস্ত সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকলে তার ব্যবহার সর্বোত্তম হবে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই তা থেকে সুবিধা বা উপকার পাবে সে সকল উপায় উপকরণই রাষ্ট্রের জিম্মাদারীতে থাকতে পারে। রাষ্ট্র যাকাত ও উশর আদায় এবং তার উপযুক্ত বিলিবন্টন, বায়তুলমালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির যথাযথ প্রয়োগ, করযে হাসানা ও মুদারিবাত ব্যবস্থার জন্যে আইন তৈরী এবং নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই বলিষ্ট ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একাজে রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আদলও ইহসান প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং সমাজে যুলুম ও বঞ্চনার সয়লাব বয়ে যাবে। একারণেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান রয়েছে ইসলামী অর্থনীতিতে। একই সাথে বেশ কিছু সম্পদের সামাজিক মালিকানাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে।

সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা

যেকোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সমাজকল্যাণ কর্মসূচী ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে গৃহতি ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই ইসলামী অর্থনীতির সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাত্মক জোর এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে বায়তুল মাল হতে ন্যূনতম মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে চিকিৎসা ও সুন্নাহতে যে নির্দেশ রয়েছে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজদেহে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়ার সম্ভবপর।

জনকল্যাণের জন্যে ইসলামে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পদে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: “এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল”।(সূরা যারিয়াত ১৯ আয়াত)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

অর্থ:“তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।” (সূরা বনি ইসরাঈল: ২৬ আয়াত)

“তোমাদের ধন-সম্পদে (যাকাত ছাড়াও) সমাজের অধিকার রয়েছে।” (তিরমিযী)

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণের তথ্য জনসাধারণের হক আদায়ের জন্যে এই রকম জোরলো তাগিদ বা নির্দেশনা নেই। সেখানে রাষ্ট্র বা সরকার জনকল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করে মর্জিমাফিক। কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শরীয়াহর দাবী অনুসারেই রাষ্ট্র ও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবেই দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য। এই সমাজে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যেমন বৈধ ও অবৈধের বা হালাল-হারামের প্রশ্ন তুলে সীমারেখা নির্ধারণ কর দেওয়া হয়েছে তেমনি সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে সমাজে সব বিশৃংখলা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানও নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ দিকটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব যৌথভাবে সরকার ও জনগণের।

তবে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ইসলামী অর্থনীতি কোন দেশে কোন অবস্থাতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্যে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অর্থাৎ ইসলামের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি আইন-বিচার-প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ সবকিছুই যুগপৎ বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই

সঙ্গে দরকার সেই মুসলমানেরও ঈমান ও আকীদার দিক দিয়ে, তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ হতে যার তুলনা হতে পারে একমাত্র সে নিজেই। প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায় তো তারই মধ্যে, প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠে যে ঘোষণা করে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ:আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

পরিশেষ

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থার উপহার দিয়েছে। কারণ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যা সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি । ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামী অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র উৎস হচ্ছে আল কোরআন এবং আস সুন্নাহ। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে থাকে। কেননা এ অর্থব্যবস্থায় মানুষের জাগতিক কাজকর্ম, জীবনধারণ,আয় ব্যয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ, ভোগ,ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, বন্টন, সঞ্চয় সবকিছুর সমাধান দেয়া হয়েছে। ইসলাম সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাক প্রতিষ্ঠা, সুদের বিপরীতে কর্জে হাসানা, ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা চালু,বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠা, যাকাত ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ সৌদি আরব তুরস্ক মালয়েশিয়া ইরান পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া মিশর বেইজিং, ফিলিপাইনের ম্যানিলা, লসবেনস,মিন্দানাও ও কলাম্বো শহরে এই সমস্ত ব্যবস্থা চালু সহ মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু সমিতি ও ইসলামিক সেন্টার আছে। তাদের অনুকরণে দেশের সরকার, ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক, ইসলামী রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক সংগঠন,সমাজসেবা মূলক সংগঠন কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এইসব ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন তাহলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ইসলাম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে ইংশা আল্লাহ।

তথ্যসূত্র

ইসলামের অর্থনীতি   মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ)

ইসলামী অর্থনীতি   মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি   মুফতি তকি উসমানী দা.বা.

https://www.at-tahreek.com

https://bjilibrary.com

https://sharebiz.net

https://www.quraanshareef.org/

https://ihadis.com/

https://www.kalerkantho.com

https://dainikazadi.net

https://bn.quora.com

https://m.somewhereinblog.net